প্রসঙ্গে

বিশিষ্ট মনীষীদের অভিমত

সংকলন ঃ

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রসঙ্গে

বিশিষ্ট মনীষীদের অভিমত

সংকলক

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

ISLAM PRASENGEY BISHISTA MANISIDER ABHIMAT

by Rabindranath Dutta

প্রকাশক

গীতিকা মাইতি

তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬

ফোন : ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল : mahamayapress@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬

পুনর্মুদ্রণ : গুরুপূর্ণিমা ১৪২৩ (ইং ২০১৭)

বর্ণ সংস্থাপন

মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং

২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, ফোন : ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ফোন : ৯১৪৩০৩৭৮১৬

মূল্য : ১৫.০০ টাকা

ইসলাম একটা চোদ্দোশো বছরের পুরনো মতবাদ। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এটাকে একটা ধর্ম বলে জানে। শুধু ধর্মই নয়, একটা সাম্যবাদী শান্তির ধর্ম বলে মনে করে। পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের রাষ্ট্রধর্ম এবং নানাদেশের মোট একশো ত্রিশ কোটি মানুষ এই ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন করেন। এই ধর্মের আকর গ্রন্থ হল কুরআন। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন আল্লা তাঁর দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কাছে নিজের বাণী পাঠিয়েছিলেন, তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। সেইসব বাণীর সংকলনই হল কুরআন, যার এক অক্ষরও পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ। মুসলমানদের মধ্যে খুব কম লোকই কুরআন পড়েছেন, কিন্তু যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশ্ববরেণ্য মহামনীষী, তাঁদের কয়েকজনের এবং আরও কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির কুরআন, ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য এই পুস্তিকায় দেওয়া হল। কিন্তু কেন তাঁদের কুরআন সম্পর্কে ওইরূপ মনোভাব, তা অবশ্য কুরআন গ্রন্থটি না পড়লে জানা যাবে না। পাঠক যাতে নিরপেক্ষভাবে নিজে বিচার করতে পারেন, তারজন্য কুরআনের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণী পরিশিষ্টে দেওয়া হল। কিন্তু পাঠকদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকল যেন তাঁরা কুরআন ও অন্যান্য উল্লিখিত বইগুলি নিজেরা পড়ে উদ্ধৃতিগুলি মিলিয়ে নেন।

হজরত মহম্মদ

ইসলামের ব্যাপারে এর প্রচারক হজরত মহম্মদের থেকে অথরিটি আর কে আছেন। তাই ইসলামের মূল লক্ষ্য যা, স্বর্গে যাওয়া—সেই সম্বন্ধে মহম্মদের উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক।

"স্বর্গের দরজা তরবারির ছায়াতে।"

(শাহী আল বুখারী হাদিস নং ৪ : ৭৩ এবং মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ৪৫৪১। হাদিস হল হজরত মহম্মদের বাণী, ক্রিয়াকর্ম ও জীবনধারার সংকলন। সারাজীবন মহম্মদ যা কিছু করেছিলেন, বলেছিলেন, সম্মতি দিয়েছিলেন কিংবা দেখেও নিন্দা করেননি সেই সবকিছুর সংকলনই হল হাদিস। আল বুখারী, সাহী মুসলিম, মিশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিজী, নাসাইয়ী, সুনানে ইবন মাজা—এগুলি প্রামাণ্য হাদিস হিসাবে স্বীকৃত এবং প্রতিটি মুসলমান কুরআনের মত এগুলিও মেনে চলতে বাধ্য।)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববরেণ্য নোবেলবিজয়ী মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মতামতটি দেখা যাক। কবিদের নানা সময়ে নানা ভাব হয়—একথা সত্য। সুতরাং কোনো কবিতা বা গল্প-উপন্যাসে ইসলাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন, তার থেকেও বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বা চিঠিপত্রে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে কী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে, অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এজন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য উপায় নেই।"

(৭ আষাঢ়, ১৩২৯, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর (১৯৮২) চতুর্বিংশ খণ্ডে 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলীতে 'হিন্দু-মুসলমান' নামক প্রবন্ধের ৩৭৫ পৃষ্ঠা।)

খিলাফত আন্দোলনের অব্যবহিত পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায়নি—এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লা হো আকবর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব 'হিন্দু এসো'—তখন কে আসবে? আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা—এ উত্তীর্ণ হয়ে কে

আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা (হিন্দুরা) লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

"পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই—তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের (মুসলমানদের) কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। —কিন্তু সে আপিল দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলের বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ নিয়ে পরস্পর (হিন্দু-মুসলমান) কৃত্রিম বন্ধুতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোন ফল হবে না।"

(মাঘ ১৩৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধের অংশ যা কালান্তর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।)

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন ঃ

"ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আরএকটা অংশে তিনি বলেছেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থানের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমনকি, হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইনমতে

প্রত্যেক জেলে পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত। ... বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও মুক্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এইজন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্‌পুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোশ-মাত্র পরে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু সিংহাসনে এখনও রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনও মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে—সেই বিধাতার বিধিবদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসেছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ। এরা এক-একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি; সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক দুপ্‌পুর বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছনদিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক দুপ্‌পুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে—সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চিৎকার শব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথেঘাটে, ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না।

(অগ্রহায়ণ ১৩৩০, বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিত সমস্যা প্রবন্ধের অংশ; কালান্তর গ্রন্থে সন্নিবেশিত)

ইসলাম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন ঃ

''যখন দুই-তিনটি বিভিন্ন মতবাদ এসে দাবি করে আমাদের মতবাদই একমাত্র সত্য, অন্য সব মিথ্যা, আমাদের ধর্মকে স্বীকার করাই স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ, তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। এভাবে ধর্মান্ধতা অন্য সব ধর্মকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়। একেই বলা যায় ধর্মজগতে বলশেভিকবাদ। **পৃথিবী সংকীর্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে একমাত্র হিন্দু প্রদর্শিত পথেই।**

(রবীন্দ্রনাথ লিখিত পরিচয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় প্রবন্ধ)

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

''দেশের অসীম দুর্গতির কথায় মন যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তখন চুপ করতে থাকতে পারিনে। ধর্মে ও নিরর্থক আচারে হিন্দুকে শতধা বিভক্ত করে রেখেছে। বিদেশির হাতে তাই পরাভবের পর পরাভব ভোগ করে আসছি। অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে আমাদের হাড় জীর্ণ। মুসলমান ধর্মে এক, আচারে এক, বাংলার মুসলমান, মাদ্রাজের মুসলমান এবং ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান, সমাজে সবাই এক, বিপদে-আপদে সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারে, এদের সঙ্গে ভাঙাচোরা হিন্দুজাত পারবে না। আরও একবার পাঠানদের হাতে কানমলা খাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে।

তুমি তো সন্তানের জননী, হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ তোমার ছেলেমেয়েদের দুর্বল স্কন্ধে চাপিয়ে একদিন তুমি চলে যাবে। কিন্তু তার কি ভবিষ্যৎ ভেবে দেখো।"

(১৯৩৩ সালের ১৬ অক্টোবর হেমন্তবালা সরকারকে রবীন্দ্রনাথের পত্র, বাংলা সাপ্তাহিক স্বস্তিকার ২১-৬-১৯৯৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত।)

''একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে বস্তুতঃ অসম্ভব করে রেখেছে—তা হল মুসলমানেরা কখনও কোনো একটি দেশের আনুগত্য স্বীকার করে না। মুসলমানদের আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছি কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ভারত আক্রমণ করলে ভারতের মুসলমানরা ভারতের হিন্দুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

বিদেশি মুসলমানদের সাথে লড়বে কিনা। তাদের উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এমনকি মহম্মদ আলির (খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন) মতো মানুষও ঘোষণা করেছেন যে কোনো অবস্থাতেই, কোনো দেশের মুসলমানরাই কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না—এটা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"

(টাইমস অফ ইণ্ডিয়া সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি : ১৮-৪-১৯২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)

স্বাধীনতার পর থেকে কিছু ব্যক্তি নিজেদের 'রামকৃষ্ণ ভক্ত' বলে দাবি করে প্রচার করেছেন যে 'যত মত তত পথ" তত্ত্বের দ্বারা পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি সব ধর্মকেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোবার বিভিন্ন পথ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীম কথিত 'রামকৃষ্ণকথামৃত'র দ্বিতীয় ভাগে পঞ্চদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে ১৮৮৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী প্রশ্ন তুলেছিলেন যে সাকার না নিরাকার—কোন্ সাধনপদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। সেই প্রসঙ্গেই রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন সাকার-নিরাকার, নির্গুণ-সগুণ, দ্বৈত-অদ্বৈত সব সাধনাই ভগবানের কাছে পৌঁছানোর পথ। প্রসঙ্গত ভালোভাবে অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নিরাকারবাদী এমনকি নাস্তিক—প্রভৃতি সনাতন ধর্মের যেসব শাখা উদ্ভূত হয়েছিল—রামকৃষ্ণদেব সেইগুলি সম্বন্ধেই ওই মন্তব্য করেছিলেন। অন্যত্র দু-একবার রামকৃষ্ণদেব ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মের উল্লেখ করলেও তাঁর প্রকৃত মতামতটি তাঁর নিজের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম, ইদানিং যে-সকল ধর্ম দেখছো এসবই তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছাতেই হবে যাবে (অর্থাৎ আসবে-যাবে)—থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানিং যেসকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ; হিন্দু ধর্ম বরাবর আছে, আর বরাবর থাকবে।"

(শ্রী কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, একবিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদের শেষ অনুচ্ছেদ।)

এই উদ্ধৃতিটি এবং আরও অনেক উদ্ধৃতি প্রমাণ করে রামকৃষ্ণদেব মোটেই অন্যসব ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সমান মনে করতেন না, তিনি নিজে সারাজীবন নিজেকে হিন্দু বলেই পরিচয় দিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

স্বামী বিবেকানন্দকে যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাতা হিসাবে ধরা যায় তবে ইসলাম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কী বলেছেন দেখা যাক ঃ

"এ বিষয়ে মুসলমানরা অত্যন্ত স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তাদের সিদ্ধবাক্য শুধু একটিই ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহম্মদুর রসুলুল্লাহ।' অর্থাৎ ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং মহম্মদই তাঁর রসুল (প্রতিনিধি)। এই সিদ্ধবাক্যের বাইরে আর যা কিছু আছে সবই নিকৃষ্ট বস্তু এবং অবিলম্বে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে—এই হল মুসলমানদের কথা। এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, মুহূর্তের হুঁশিয়ারি দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে; যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত নয় তাকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের সঙ্গে মতে মিলছে না এমন যত গ্রন্থ আছে সেগুলোকে দগ্ধ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে অতলান্তিক মহাসাগর পর্যন্ত পাঁচশত বর্ষব্যাপী পৃথিবীর বুকে এই এক কারণে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে। এই হল ইসলাম।"

(ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডেনার শেক্সপীয়ার ক্লাবে ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ সালে প্রদত্ত ভাষণের রামকৃষ্ণমিশন স্বীকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল ভাষণটি 'টিচার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড নামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশনা বিভাগ অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক ১৯৭১ সালে মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠা।)

এর পরেও 'যত মত তত পথ'-এর তত্ত্ব আর দাঁড়ায় কি? আরও শুনুন ঃ

"মানুষ যত স্বার্থপর হয় ততই দুর্নীতিপরায়ণও হয়। কোনো জাতির ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। যে জাতি কেবল নিজেদের ছাড়া আর কিছু জানে না, জগতের মধ্যে তারাই হয় সবথেকে নিষ্ঠুর ও শঠ। আরবদেশের একজন নবী (মহম্মদ) কর্তৃক যে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল (ইসলাম) সে ধর্মের মতো এমন নিষ্ঠুর অদ্বৈতবাদী

ধর্ম আর কোথাও কখনও প্রবর্তিত হয়নি; পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মের মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণও করা হয়নি। কোরাণে বলা হয়েছে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নয় (অর্থাৎ কাফের) তাদের হত্যা করা উচিত। কাফেরকে (অমুসলমানদের) হত্যা করাটাই হল তার প্রতি করুণা প্রদর্শন। কেননা কাফেরকে হত্যা করতে পারলে তবেই একজন মুসলমান সেই স্বর্গে যেতে পারবে, যে স্বর্গ সর্বদা সুন্দরী হুরী পরিবৃত, যে স্বর্গ ইন্দ্রিয় ভোগ সুখের মহাতীর্থ। এই রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা আপনারা চিন্তা করুন। চিন্তা করুন এমন ধর্ম বিশ্বাসের পরিণতিই বা কি!"

(১৮ নভেম্বর, ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের রামকৃষ্ণ মিশন স্বীকৃত বঙ্গানুবাদ। ভাষণটি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ'র দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫২-৩৫৩ পৃষ্ঠায় 'প্রাকটিকাল বেদান্ত' চতুর্থ ভাগ—নামক প্রবন্ধে সংকলিত হয়েছে। মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণে বিবেকানন্দ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫২-৩৫৩ পৃষ্ঠা)

আরও শুনুন, বিবেকানন্দ কী বলেছেন ঃ

"যে-কোনো ধর্ম যে-কোনো নির্মম ফতোয়া জারি করতে পারে। উদাহরণ প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মের কথাই বলা যায়। ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের অধিকার দেওয়া আছে তারা অমুসলমানদের হত্যা করতে পারে। কোরাণ শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "অবিশ্বাসীরা যদি মুসলমান না হতে চায়, তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে। অগ্নিদগ্ধ করে অথবা শাণিত তলোয়ার দিয়ে কাফের অর্থাৎ অমুসলমানদের হত্যার নির্দেশ ইসলামে দেওয়া হয়েছে।"

(১৮৯৬ সালে ১৭ নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের রামকৃষ্ণ মিশন স্বীকৃত বঙ্গানুবাদ, যা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত ৩য় ভাগ নামে রামকৃষ্ণ মিশনকৃত কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ (১৯৭১) দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠা)।

বিবেকানন্দ ইসলাম ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"ইসলামের প্রতিটা পদক্ষেপ ঘটেছে তরবারির জোরে, এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে। ইসলাম গ্রহণ কর, নয়তো মর—আর কোনো বিকল্প নেই।"

১৮৯০ সালের ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাতে ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে দেওয়া বক্তৃতা। 'দ্য ওয়ে টু দ্য রিয়েললাইজেশন অফ এ ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন' প্রবন্ধে সংকলিত।

(১৯৯৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দ রচিত জ্ঞানযোগ গ্রন্থের ৩৫৯ পৃষ্ঠা। মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৯-৩৭০ পৃষ্ঠা।)

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ

"ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যায়? যারা মুসলমান নয়, তারা এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে না, বরং তার গলা কাটা যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।"

(মায়াবতী সংস্করণ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮০ পৃষ্ঠা।)

মুসলমানদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

"মুসলমানগণ যখন এই দেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাহাদের ঐতিহাসিক (ফেরিস্তার) মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটি হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তি দোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে, কারণ মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা (হিন্দু) ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটিরও অধিক ছিল, কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রিস্টানের রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটি লোক খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রিস্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দু জাতি ও ধর্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

(স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭-৯৮ সালে লিখিত বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলীর 'ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী' নামক অধ্যায়ের ১ নম্বর ধারা)।

স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ

"যে কেহ হিন্দুধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নহে, একটি শত্রু অধিক হয়। ওইপ্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রু দ্বারা মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের অধ্যায়ের ১৫ নম্বর ধারা ও ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে 'অন দ্য বাউণ্ডস্ অব্ হিন্দুইজম্' নামে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বিবেকানন্দ ঠিক একই কথা বলেছেন। মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠা)।

ঋষি অরবিন্দ

২৩-৭-১৯২৩ তারিখে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"সহিষ্ণুতা যে ধর্মের মূল নীতি, তার সঙ্গে তুমি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাস করতে পারবে। কিন্তু যে ধর্মের মূলনীতি 'আমি তোমাকে সহ্য করব না' তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস কীভাবে সম্ভব। এসব লোকের সাথে তুমি কীভাবে ঐক্য রাখবে? হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নিশ্চয় এই ভিত্তিতে সম্ভব নয় যে মুসলমানেরা ক্রমাগত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবে, কিন্তু হিন্দুরা কেন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করবে না। এভাবে তুমি ঐক্য আনতে পারবে না। মুসলিমদের নিরীহ (Harmless) করে তোলার একটাই পথ, তা হল, তাদের ধর্মের উপর থেকে অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করানো।"

(এ. বি. পুরানি সংকলিত, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'ইভনিং টকস উইথ শ্রী অরবিন্দ' গ্রন্থের ২৯১ পৃষ্ঠা)

১৪-৪-১৯২৩ তারিখে এক শিষ্যের উত্তরে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে তাঁরা (পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে এক অন্ধভক্তির বিষয়ে পরিণত করেছেন। প্রকৃত তথ্য অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই; হয়তো **একদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই করতেই হবে, এবং তারজন্য তাদের প্রস্তুত হতেই হবে।** হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অর্থ হওয়া উচিত নয় হিন্দুদের অধীনীকরণ। প্রত্যেকবার হিন্দুদের নম্রতা হিন্দুদের পরাজয় ডেকে এনেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান হল হিন্দুদের নিজেদের সংগঠিত হতে দেওয়া, তাহলেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে, এবং সমস্যাটির সমাধান স্বতঃই হয়ে যাবে। অন্যথা, আমরা একটি মিথ্যা সন্তোষবোধের মধ্যে সুপ্ত হয়ে যাই যে, আমরা একটি কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি, যদিও বাস্তবিকপক্ষে আমরা শুধুই তাকে মুলতুবি রেখেছি মাত্র।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠা।)

৩০-১২-১৯৩৯ তারিখে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"আমি শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসকে (১৯২৩ সালে) বলেছিলাম যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন,

নয়তো গৃহযুদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তিনি আমার সাথে একমত হয়েছিলেন এবং এর সমাধানও করতে চেয়েছিলেন।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৬৯৬ পৃষ্ঠা)

ভারতীয় সমাজে মুসলমানদের মিশে যাওয়া সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ২৯-৬-১৯২৬ তারিখে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"**মুসলমানরা সহিষ্ণুতা না শিখলে, আমার মনে হয় না, ভারতীয় সমাজে তাদের মিশে যাওয়া সম্ভব।** হিন্দুরা সহিষ্ণু, নতুন ধারণা গ্রহণ করার ব্যাপারেও তারা খোলামেলা, অন্যকে আপন করে নেওয়ার হিন্দুদের সংস্কৃতিও অত্যাশ্চর্য, কিন্তু তা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি তাদের (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের) মূল নীতিটি স্বীকার করে নেওয়া হয়।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠা।)

গুরু নানক

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন ঃ

"সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি সব মুসলমানই অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং হিন্দুদের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার করেছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের দেহ শকুনের মুখে ফেলে দিয়েছে, অনেক হিন্দুকে দেহে পেরেক পুঁতে বা জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে হত্যা করেছে, কাউকে বা কুকুর দিয়ে খাইযেছে। যেসব হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের নানাভাবে অত্যাচার করা হয়। যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক অপহরণ করে মুসলমানদের হারেমে রাখা হয়েছিল। মুসলমান কাজীরা ঘুষ নিয়ে দিনকে রাত করে দিত।"

(নানক প্রকাশ, প্রেমনাথ যোশী লিখিত, দিল্লীর রাষ্ট্রীয় হিন্দু মঞ্চের ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত প্যান ইসলামিজিম (রোৎলি ব্যাক গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

ভারতের সংবিধান রচয়িতার মধ্যে অন্যতম জওহরলালের সময়ে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রী, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং চরম ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত বাবাসাহেব আম্বেদকর ইসলাম সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ইসলামিক আইন অনুসারে সারা পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত, দার-উল-ইসলাম (মুসলমানদের দেশ) ও দার-উল-হারব্ (অর্থাৎ যুদ্ধের দেশ)। কোনো দেশ মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হলে তা হল দার-উল-ইসলাম। যেসব দেশে মুসলমানরা বসবাস করছে অথচ তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নেই, সেই দেশ হল দার-উল-হারব্। সুতরাং ইসলামের বিধান অনুসারে ভারতবর্ষ কখনও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি হতে পারে না। এটা শুধু মুসলমানদের দেশ হতে পারে, কিন্তু কোনোমতেই হিন্দু ও মুসলমানদের সমান অধিকার নিয়ে বসবাসের ক্ষেত্র হতে পারে না। এটা মুসলমানদের দেশ তখনই হতে পারে যদি এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকে। যখনই ভারতের শাসনভার অমুসলমান (হিন্দুদের) হাতে চলে যাবে, এটা আর মুসলমানদের দেশ থাকবে না, বরং মুসলমানদের কাছে 'যুদ্ধের দেশ' বলে পরিগণিত হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী কেবলমাত্র তাত্ত্বিক নয়, এটা একজন মুসলমানের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করার মত একটি কার্যকরী শক্তি।

(ডাঃ বি. আর আম্বেদকরের লিখিত, ১৯৪৬ সালে মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ) পাকিস্তান অব দ্য পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া, পূর্বনাম থট অন পাকিস্তান গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২৯৪)

আম্বেদকর আরও বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"এটা বলা যায় যে, দার-উল-হারব অর্থাৎ অমুসলমান দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বাঁচার একমাত্র উপায় নয়। ইসলামিক বিধানে জেহাদ বলে একটি কথা আছে—এর দ্বারা বোঝায় কোনো দেশের মুসলমান শাসকের অবশ্য কর্তব্য হল সারা পৃথিবীতে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে দুটি শিবির আছে দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারব্। পৃথিবীর সব দেশই এর কোনো না কোনটির অন্তর্ভুক্ত।

সক্ষম মুসলমান শাসকের কর্তব্য হল দার-উল-হারব্কে (অর্থাৎ অমুসলমানদের দেশকে) দার-উল-ইসলামে পরিণত করা।

বাস্তব সত্যটা হল যে ভারত যদি কেবলমাত্র মুসলমানদের শাসনে না থাকে তবে তা হল একটি দার-উল-হারব্ এবং ইসলামের আইন অনুসারে মুসলমানদের কর্তব্য হল ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা।

কেবলমাত্র জেহাদ ঘোষণা করাই নয়, জেহাদকে সফল করার জন্য যে-কোনো বিদেশি ইসলামিক রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করাও কর্তব্য, অথবা, কোনো বিদেশি মুসলিম রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে তাকে সফল করার জন্য ভারতীয় মুসলমানরা সাহায্য করতে বাধ্য।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৯৫-২৯৬ পৃ.)

শ্রী বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"মুসলমানদের কাছে হিন্দুরা (সব অমুসলমানরাই) কাফের, (যারা ইসলাম মানে না)। একজন কাফের কখনও সম্মান পেতে পারে না। কাফেররা নিম্নজাত এবং মুসলমানশাসিত সমাজে প্রতিষ্ঠাহীন। সেই কারণে একটা কাফের-শাসিত রাষ্ট্র হল 'দার-উল-হারব্' অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে যুদ্ধভূমি, যা কিনা যে-কোনো উপায়ে মুসলমানদের জয় করতেই হবে এবং 'দার-উল-ইসলাম'-এ অর্থাৎ ইসলাম শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এর থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, কোনো মুসলমান কখনওই কোনো হিন্দু বা অমুসলমান শাসিত সরকার মেনে নিতে পারে না।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ৩০১)

আম্বেদকর আরও বলেছেন ঃ

"ইসলাম সমাজ একটা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং তা মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য করে তা অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সার্থক এবং অত্যন্ত বিচ্ছিন্নকারী পার্থক্য। ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব মোটেই সকল মানুষের জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব নয়; এটা মুসলমানদের জন্য শুধুমাত্র মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। সেখানে মৈত্রীভাব আছে, কিন্তু তার সুবিধা শুধুমাত্র মুসলমান সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলমান সমাজের বাইরে যারা আছে, তাদের জন্য মুসলমানদের ঘৃণা ও শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইসলামের দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, ইসলাম সামাজিক

স্বায়ত্তশাসনের একটি ব্যবস্থা এবং এটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ একজন মুসলমানের আনুগত্য তার বসবাসের দেশের প্রতি নয়, বরং তার আনুগত্য কেবল তার ধর্মের প্রতি। যেখানেই ইসলাম শাসন করেছে, সেটাই তার দেশ। অন্যভাবে বললে, ইসলাম কখনই একজন মুসলমানকে তার মাতৃভূমি হিসাবে ভারতকে গ্রহণ করতে এবং একজন হিন্দুকে তার আত্মীয় বলে ভাবতে দিতে পারে না। সম্ভবতঃ সেই জন্যই একজন মহান ভারতীয়, কিন্তু প্রকৃত মুসলমান, মৌলানা মহম্মদ আলি, ভারতের চেয়ে জেরুজালেমেই সমাহিত হতে চেয়েছিলেন।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১।)

"মুসলিম লিগের 'সাম্প্রদায়িক মুসলমান এবং তথাকথিত 'জাতীয়অবাদী' মুসলমানদের মধ্যে সত্যি কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বোঝা দুষ্কর। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভাবাবেগ, লক্ষ্য এবং নীতিসমূহ আদৌ কংগ্রেসের সাথে মেলে কিনা বা মুসলিম লিগের থেকে তাদের আলদা করে দেওয়ার কারণ আছে কিনা তা ঘোর সন্দেহের বিষয়। কংগ্রেসেরই অনেক সদস্য মনে করেন এই দুই রকম মুসলমানের মধ্যে আসলে কোনই পার্থক্য নেই, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের মুসলমানরা আসলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদেরই প্রতিনিধি।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০৮)

"ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক বা শৈব ও বৈষ্ণবদের মতো হিন্দু ও মুসলমানরা কেবলমাত্র দুটি ধর্ম সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীই নয়, তারা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৩)

"হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধন কেন সম্ভব নয় তার প্রকৃত ব্যাখ্যা হল—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার পার্থক্যটা সাধারণ নয়। এদের মধ্যেকার বিরোধিতাটা কেবলমাত্র বাহ্যিক বা বৈষয়িকও নয়। এই বিরোধিতার মূলে আছে তাদের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কার ও সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত বৈষম্য। আর রাজনৈতিক বিরোধটা কেবল এগুলিরই প্রতিফলন মাত্র।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ৩২৯)

"মুসলমান আক্রমণকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বুকে নিয়েই ভারতে এসেছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা কেবল ঘৃণার গান গেয়ে ফেরার পথে কয়েকটি হিন্দু মন্দির পুড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সেটা হলেই বরং আশীর্বাদ হত। এইরকম ফলহীন কাজ করে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা একটি ফলপ্রসূ কাজ করে গেছে—তারা ভারতে ইসলামের বীজ বপন করে দিয়ে গেছে। সেই বীজ থেকে চারা গাছটির বৃদ্ধিও লক্ষণীয়। এটি কোনও গ্রীষ্মের চারা নয়, এটা ওক গাছের মত বিশাল ও মজবুত। উত্তর ভারতে এর বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী। অন্য জায়গার তুলনায় এখানে ইসলামের আক্রমণ-তরঙ্গের পলিমাটি জমেছে সবচেয়ে বেশী এবং নিষ্ঠাবান মালীর মত এইসব ইসলামিক আক্রমণ সেই গাছে জলসিঞ্চনের কাজ করেছে। উত্তর ভারতে ইসলামের অরণ্য এত ঘন যে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সামান্য তলানিটুকু এখানে লতাগুল্মের মতো মনে হয়।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৫)

"তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল, মুসলমানরা গুণ্ডামির রাজনীতি অবলম্বন করেছে। মুসলমানরা যে গুণ্ডামির রাজনীতিকেই তাদের পাকাপোক্ত নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে এই দাঙ্গাগুলোই তার যথেষ্ট প্রমাণ।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৬৯)

"মৌলবাদী মুসলমানদের হাতে যেসব প্রভাবশালী হিন্দুরা মারা পড়ল তাদের সংখ্যা কম না বেশী, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল এইসব খুনীদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল। যেখানে আইনের প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে খুনীরা শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু মুসলমান নেতারা কখনই ঐ খুনীদের নিন্দা করেনি। বরং মুসলমান সমাজ খুনীদের ধর্মীয় হিসাবেই দেখেছে এবং তাদের প্রতি সুবিচারের দাবীতে আন্দোলন করেছে। উদাহরণ হিসাবে লাহোরের ব্যারিস্টার শ্রীবরকত আলির কথা বলা যায়। ইনি নাথুরামলের হত্যাকারী আব্দুল কায়ুমের হয়ে মামলা লড়তে গিয়ে আদালতে বলেছিলেন কায়ুমকে নাথুরামলের হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না কারণ তার কাজটি ছিল কোরানের দ্বারা সমর্থিত। মুসলমানদের এই প্রবণতা সহজবোধ্য, কিন্তু শ্রী গান্ধীর কাজকারবার বোঝা দায়।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৭)

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার চিরস্থায়ী ও বাস্তব সমাধান সম্পর্কে দেশ বিভাগের আগে আম্বেদকর বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"ভারতে মুসলমানরা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও শহরগুলিতেই তাদের সংখ্যা বেশি। (পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য) ভারতকে যেভাবেই ভাগ করা হোক না কেন কোনোভাবেই বিশুদ্ধ (হিন্দু বা মুসলমান) এলাকা গঠন করা সম্ভব নয়। একমাত্র হিন্দু-মুসলমান সংখ্যালঘু লোক বিনিময় করা হলেই তা সম্ভব। যতক্ষণ না তা করা হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ—সংখ্যালঘু সমস্যা হিন্দুস্থানে পূর্বের মতোই থেকে যাবে এবং হিন্দুস্থানে ক্রমাগত জাতি-রাজনীতিগত বিরোধ হতেই থাকবে।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১১৭ পৃ.)

"এতে সন্দেহমাত্র নেই যে (ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে) সংখ্যালঘু বিনিময় করাই সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার একমাত্র সমাধান।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১১৬)

"পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও যে সংখ্যালঘু সমস্যা থেকেই যাবে—তারদিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করার দুটি উপায় আছে। প্রথমটি হল—সংবিধানে সংখ্যালঘুর জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় হল পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতে নিয়ে আসা। বহু লোক এই সমাধানই পছন্দ করছেন এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় করা হলে তবেই তারা দেশ বিভাগের পক্ষে মত দেবেন। কিন্তু অনেকে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ও বিভ্রান্তিকর সমস্যা হিসাবে দেখছেন। নিঃসন্দেহে এটা ভীতিবিহ্বল মনের চিন্তা। কিন্তু শান্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলে মনে হয় এই সংখ্যালঘু সমস্যাটা আদৌ কঠিন বা বিভ্রান্তিকর নয়।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭৯)

"যদি গ্রীস, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মতো ছোটো ও সীমিত শক্তির দেশ সংখ্যালঘু বিনিময় করতে পারে তবে এটা মনে করার কোনোই কারণ নেই যে ভারতীয়রা তা পারবে না। যে সংখ্যক সংখ্যালঘুকে স্থানান্তরিত করতে হবে তা এমনকিছু বেশি

নয় এবং কয়েকটি বাধাও অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার এই সুনিশ্চিত উপায়টি অবহেলায় পরিত্যাগ করলে তা হবে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৬)

আম্বেদকর বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"আমি বলতে পারি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অসম্ভব, এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত, অন্তত যতটা বোঝা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য মরীচিকার ন্যায়। আজ এটা সুদূর পরাহত, কল্পনারও অতীত।"

(বি. আর আম্বেদকরের পাকিস্তান অব দ্য পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠা)

গান্ধীজির খিলাফত আন্দোলন শুরু করার পর কেরলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মোপলা মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবেশি হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেন ওই হিন্দুরাই তুর্কী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করেছেন। তারা শতশত হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করে। শতশত হিন্দুকে হত্যা করে, তাদের বাড়ি, দোকান লুঠ করে পুড়িয়ে দেয়। এই বর্বরতার সংবাদ পেয়ে গান্ধীজি মন্তব্য করলেন, "মুসলমানরা তাদের ধর্ম যা শিক্ষা দিয়েছে বলে মনে করে, ঠিক তাই-ই করেছে।"

গান্ধীজির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আম্বেদকর বলেছেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"আমার ভয় হয় যে এটাই সত্য; কিন্তু সভ্য দেশে সেইসব লোকের কোনো স্থান নেই, যাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়—যারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করতে অস্বীকার করে (অর্থাৎ মুসলমান হতে অস্বীকার করে)—তাদের হত্যা করতে, সম্পদ লুণ্ঠন করতে, তাদের নারী ধর্ষণ করতে, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে অথবা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করতে।"

(বি. আর আম্বেদকর ঃ পাকিস্তান অব দ্য পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া)

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

"আশ্চর্য নয় যে ৮ মে, ১৯৪৬ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (লর্ড) ওয়াভেলকে জানালেন—জোট ব্যাপারটাই সংহতি নাশ করবে। তিনি নাকি এও বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ অনিবার্য এবং এখনই তা হয়ে যাক।"

(পেণ্ডরেলমুন সংকলিত ভাইসরয়েজ জার্নাল, পৃষ্ঠা ২৬১ অবলম্বনে অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থের ৪১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন)

রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের জনক এবং সবরকম সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী রাজা রামমোহন রায় বলেছেন ঃ

"ওইসব দৈবী (হিন্দু ধর্মীয়) নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইসলামধর্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির (হিন্দুর) অনেক ক্ষতি করেছে, ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে, এমনকি মৃত্যুভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা (হিন্দুরা) ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইসলামানুবর্তীরা কোরানের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা—পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর ও অবিশ্বাসীদের ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করে বেঁধে আন এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের (আল্লার) নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের (হিন্দুদের) বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের মতে ওই পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক (ঘৃণ্য)। সেইজন্যই ইসলামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদনায় মত্ত হয় এবং তাদের ঈশ্বরের (আল্লার) আদেশ মানবার উৎসাহে "বহু দেবদেবাদিদের" (অর্থাৎ হিন্দুদের) ও মেষ পয়গম্বরের (মহম্মদের) ধর্ম প্রচারে "অবিশ্বাসীদের" (অমুসলমানদের) বধ করতে ত্রুটি করেনি।"

(১৮০৪ সালে ফারসি ভাষায় রাজা রামমোহন রায় লিখিত তুহ্ফত্-উল্-মুওয়া হিদ্দিন অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদীদেরকে উপহার' নামক গ্রন্থের শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাম কৃত বঙ্গানুবাদের ১৯৪৯ সালের প্রকাশিত প্রবন্ধের 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম' নামক অনুচ্ছেদ থেকে সংগৃহীত। হরফ প্রকাশনীর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অখণ্ড রামমোহন রচনাবলীর ৭২৬-৭২৮ পৃষ্ঠা)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানবদরদী, সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সংকোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।"

তারপর শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন, "কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধুই অশিক্ষার ফল?" তিনি এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, "যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের (মুসলমানদের) কমিবে, যখন বুঝিবে—যে-কোনো ধর্মই হউক, তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করিবার মতো এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনোদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।"

(দৈনিক বসুমতী, ১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩ প্রকাশিত। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনাবলীতে এই প্রবন্ধটি "বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' নামে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মুসলমান তোষণের কারণে অধিকাংশ রচনাবলীতেই এটা সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটির জন্য দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং পাঞ্চজন্য প্রকাশিনী, ১০ কে, এস. রায় রোজ, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত 'বর্তমান হিন্দু মুসলিম সমস্যা' পুস্তক দেখুন)

হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন ঃ

"বছর কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংসা অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এ দেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভালো বলিয়া নয়, চাই-ই এইজন্য যে, তা না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি, একথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দ কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চিৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড়ো পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপর এই মিলন ছায়াবাজির রোশনাই জোগাইতে হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাব নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফত আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে।

মিলন হয় সমানে সমানে। (হিন্দু-মুসলমানের) শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় তো সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফত করিয়া, প্যাক্ট করিয়া ডান ও বাঁ— দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-এক জনের হয়তো ছিল কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না।

দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতে তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং এ আকাশকুসুমের (হিন্দু-মুসলমান ঐক্য) আত্মবঞ্চনা করি কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে কিন্তু ওই গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোনো কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। আজ বাংলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি।

জ্ঞাতি বধে মহাপাপ, অথএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন প্রয়াসের মতো অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না।

"... অতএব হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে, হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন।"

"...হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়, নিজের কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।"

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এই দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, এ দেশে তাহার চিত্ত নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি? এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছুপিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে? আজ এ কথাটা একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে এ কাজ শুধু হিন্দুর—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবার আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটিই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যাহা এক, দুই, তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবের মধ্যে গণ্য করে না।

"হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়তো তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে এই দুই প্রতিবেশি জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপূত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস (হিন্দু-মুসলমান মিলন) যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোনো কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে তো এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোনো সুবিধা হইবে না। অথচ উপরে, নিচে, ডাইনে, বামে চারিদিক হইতে একই কথা বারংবার শুনিয়া ইহাকে এমনই এক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে, জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোনো গতি আছে, তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, (মুসলমানের দ্বারা) অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি,

"তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায় ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের (মুসলমানদের)। কিন্তু, বস্তুত হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের উপর।"

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

"জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা কোনো আগ্রহ দেখায়নি—মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য। তারা ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করে না।"

(২ এপিল, ১৯২৫ সালে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীর বক্তব্য)

গান্ধী বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক মুসলমানই জন্মগতভাবে "bully" এবং প্রত্যেক হিন্দুই জন্মগতভাবে ভীরু"

(পপুলার প্রকাশনী, ৩৫ সি ভাবদেও রোড, মুম্বাই ৪০০০৩৪ কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ধনঞ্জয় কির লিখিত গান্ধীজীর জীবনীর প্রথম সংস্করণের ৪০২ পৃষ্ঠা)

(বিশেষ দ্রষ্টব্য) বিতর্ক এড়ানার জন্য : bully" শব্দটির অনুবাদ আমরা করিনি, প্রোগেসিভ ইংরাজি-বাংলা অভিধানে (ননীগোপাল আইচ সংকলিত, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রকাশিত) "bully" শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'দুর্বলের উপর নির্মম অত্যাচরকারী' বা 'ষণ্ডা', পাঠককে অনুরোধ করছি ডিকসনারি থেকে মানেটি দেখে নিন। গান্ধীজির এই উক্তির জন্য বর্তমান প্রকাশকের কোনো দায়িত্ব নেই। এইধরনের উক্তি গান্ধীজি একাধিকবার করেছেন।

মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করলে, হিন্দুদের কি কর্তব্য সে প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন : "আমার বোনকে কেউ ধর্ষণ করলে আমি তার পদ চুম্বন করব।"

(৬ জুলাই, ১৯২৯ সালের নবজীবন দান পত্রিকা অবলম্বনে, ধনঞ্জয় কিরের গান্ধীজির জীবনীর পৃ. ৪৭৩)

পাঞ্জাবের মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু ও শিখ ধর্ষিত মহিলাদের ধর্ষণকালে কী করা উচিত সেই প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছিলেন যে, "তাদের কখনওই উচিত নয় মুসলমানদের বাধা দেওয়া, বরং তাদের উচিত ধর্ষণকালে নিজেদের জিভ কামড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মুসলমান ধর্ষণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে চুপ করে থাকা যতক্ষণ না ক্রমাগত পৈশাচিক ধর্ষণের ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে।"

(ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ারের লেখা বিখ্যাত ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট গ্রন্থের ৩৮১ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে আমৃত্যু ধর্ষণ বরণ করে নেওয়ার উপদেশ গান্ধীজি বহুবার হিন্দু মহিলাদের দিয়েছিলেন। নোয়াখালির হিন্দু নিধন যজ্ঞের সময়ও তিনি হিন্দু মেয়েদের অনুরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন।

(নির্মল বোস লিখিত 'মাই ডেজ উইথ গান্ধী' গ্রন্থ)

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৪ সালে ইসলামিক আগ্রাসনের মুখে হিন্দুসমাজের অসহায়তা দেখে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

"হয়তো বা আমাদের হিন্দু ও ভারতীয় জাতিরও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একটি জাতির বিলোপসাধন ২০০/৫০০ বৎসরে হয়, আবার ৫০/১০০০ বৎসরেও হয়. উপস্থিত হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি সমষ্টিগতভাবে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়াছে এবং রোগকে উপেক্ষা করিয়া এই সমাজ ও জাতি এখন মহোল্লাসে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান ইহাকে বাঁচাইতে পারেন।"

(সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভারত সংস্কৃতি')

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন :

"কুরাণ বিষয়ক আলোচনা সুধীগণের নিকট উপস্থিত করা হইল, এখন এই পুস্তক কিরূপ তাহা তাঁহারাই বিচার করুন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে তো বটেই, কোনো বিদ্বান ব্যক্তির রচিত জ্ঞানের পুস্তকও নহে। উহা (কোরাণ) মানবাত্মাকে পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শান্তিভঙ্গ, উত্তেজনা, উপদ্রব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে। আরও জানিবার বিষয় এই যে, কুরাণ পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার স্বরূপ।"

(আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লিখিত সত্যার্থ প্রকাশের আর্যসমাজ প্রকাশিত বঙ্গানুবাদের চতুর্দশ অধ্যায়)

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

বিখ্যাত মনীষী ও চিন্তানায়ক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন :

"মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের বিধান অনুয়ায়ী মুসলমানও তেমনই সকল মুসলমানকে আপন ও সকল হিন্দুকে পর মনে করিতে বাধ্য। বরঞ্চ মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীন সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের জন্য অমুসলমান সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বেশি সজ্ঞান। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশমতো মুসলিমমাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—১. দার-উল্-ইসলাম ২. দার-উল্-হরব্। দার-অল্-হরবের অর্থ যুদ্ধের দেশ, অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-উল্-হারবের অর্থ যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থান করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোনো মুসলমান অমুসলমানের অধীন থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, অমুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এইজন্যই অমুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-উল্-হারব্, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্য অমুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোনো মৈত্রী হইতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত না দার-উল্-হারব্ দার-উল্-ইসলামে পরিণত হইবে—

ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমানমাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে। জিহাদের নিয়ম অনুযায়ী অবিশ্বাসীকে হয় (১) মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা (২) মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রিত (জিম্মী) হইয়া থাকিতে হইবে, কিংবা (৩) যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান জানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অমুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোনো পথ নাই।"

(নীরদ চৌধুরীর আমার দেশ আমার শতক গ্রন্থের 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহিত। ২০০০ সালে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরী শতবার্ষিকী সংকলনের ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠা)

রোনাল্ড রেগন

আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন বলেছেন ঃ

"সম্প্রতি আমরা একটা ধর্মযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখছি, আক্ষরিক অর্থেই—কারণ মুসলমানরা তাদের জেহাদের মূল ধারণাতে ফিরে আসছে যে, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াটাই তাদের স্বর্গে যাওয়ার উপায়।"

(১৭ নভেম্বর ১৯৮০ সালের টাইম পত্রিকায় ৩৭ পৃষ্ঠায় 'অ্যান ইনটারভিউ উইথ রোনাল্ড রেগন'।)

মার্গারেট থ্যাচার

ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৯-১৯৯০) লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন, (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"আজকের দিনে বলশেভিজম-এর মতো চরমপন্থী ইসলামও একটা সশস্ত্র মতবাদ। এটা একটা আক্রমণাত্মক ধর্মতত্ত্ব যা সশস্ত্র, ধর্মান্ধ অনুগামীদের দ্বারা প্রসার লাভ করছে। কমিউনিজমের মতো এটাকে দমন করার জন্যও সর্বাত্মক, দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি প্রয়োজন।"

(ফেব্রুয়ারি ১২, ২০০২ তারিখের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্গারেট থ্যাচারের লেখা 'ইসলাম ইজ দ্য নিউ বলশিভিজম' প্রবন্ধ)

উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন

ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন :

"যতদিন কোরাণ আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই।"

(১৪০৯ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা বিশ্ব হিন্দুবার্তার ১৭ পৃষ্ঠা)

অ্যানি বেসান্ত

শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত বলেছেন,

"ভারতের উপর যেসব আঘাত নেমে এসেছে, খিলাফত পরবর্তী দাঙ্গা তার অন্যতম। অমুসলমানদের প্রতি মুসলমানদের অন্তঃস্থলের প্রবল ঘৃণা নগ্ন ও নির্লজ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের তরবারির ধর্মকেই তারা তাদের রাজনীতির নিয়ামক করেছে। ভারতের স্বাধীনতার পর মুসলমানদের ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার দুরভিসন্ধির কথাটা মনে রাখতে হবে।"

(অ্যানি বেসান্তের 'দ্য ফিউচার অব ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স' গ্রন্থের ৩০১-৩০৫ পৃষ্ঠা)

স্যার যদুনাথ সরকার

পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মুঘল ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইসলামের যে পরিচয় পেয়েছেন তা তাঁর মন্তব্যেই পরিষ্কার :

"ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাকে পাপ বলে মনে করা হয়। আর সবথেকে বড়ো পাপ হল বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস। এইধরনের বিশ্বাস আল্লার প্রতি সবথেকে বড়ো অকৃতজ্ঞতা।"

সুতরাং ইসলামের ধর্মতত্ত্ব প্রকৃত মুসলিমকে আল্লাহর পথে নিরন্তর জেহাদ করতে শেখায়। অমুসলমানদের দেশে (অর্থাৎ দার-উল্-হারব্) নিরন্তর যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ দেশটি দার-উল্-ইসলামে পরিণত না হয়। ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর সমস্ত অমুসলমানকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে। পুরুষ বন্দীদের হত্যা করতে হবে কিংবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হবে। অমুসলমানদের স্ত্রী-কন্যা এবং শিশুদের

ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে।"

(ওরিয়েন্ট লংম্যান কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রকাশিত স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত 'হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১৬৩ -১৬৪ পৃষ্ঠা)

স্যার যদুনাথ আরও বলেছেন :

"নির্দোষ হলেও অমুসলমানকে হত্যা করা ইসলামে একটা কৃতিত্ব বলে মনে করা হয়। মুসলমানের পক্ষে (আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য) নিজের কুপ্রবৃত্তি জয় করা বা আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। তাকে কেবল প্রতিবেশি অমুসলমানদের হত্যা করতে হবে, তাদের জমি, ধনসম্পদ ও স্ত্রীদের হরণ করতে হবে ; কেবল এসব করেই একজন মুসলমান স্বর্গে যেতে পারে। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা লুণ্ঠন ও হত্যাকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে, সুতরাং এটা মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা বিশ্বশান্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ।"

স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন :

"কোরাণের আইন অনুসারে একটি মুসলিম বাদশা ও তার অমুসলমান প্রতিবেশি রাজ্যগুলির মধ্যে কখনও শান্তি বিরাজ করা সম্ভব নয়। কারণ অমুসলমান রাজ্যগুলি হল দার-উল্-হারব্ অর্থাৎ 'যুদ্ধভূমি'। তাই মুসলমান বাদশার অবশ্যকর্তব্য হল সেই অমুসলমান রাজ্যগুলি লুণ্ঠন করা ও তাদের জনগণকে হত্যা করা, যতক্ষণ না তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে এবং ওই রাজ্য দার-উল্-ইসলামে অর্থাৎ কেবলমাত্র মুসলমানের রাজ্যে পরিণত না হচ্ছে। কেবল তারপরেই ওই রাজ্যের প্রজারা রেহাই পেতে পারে।"

আসলাফ অথবা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান

(ক) কৃষিজীবী শেখ, এবং অন্যরা যারা গোড়ায় হিন্দু ছিল কিন্তু কোনও পেশাজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না এবং যারা আশ্রাফ সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার পায়নি যেমন 'পিরালি' ও 'ঠাকরাই'।

(খ) দর্জি, গোলা, ফকির ও রংগ্রেজ।

(গ) বারহি, ভাতিয়ারা, চিক, চুরিহার, দাই, ধুনিয়া, গদ্দি, গালাল, কমাই, কুলা-কুঞ্জারা, লাহেরি, মাহিফেয়ুশ, মাল্লা, নুলিয়া, নিকারি।

(ঘ) আফদল, বাখো, বেদিয়া, ভাট, চাম্বা, দাকালি, ধোবি, হাজ্জাম, মুচি, নগচি, নাট, পানওয়ারিয়া, মাদারিয়া, তুন্তিয়া।

আরজল বা অধস্তন শ্রেণীর মুসলমান

বন্থার, হালালখোর, হিজরা, কসবি, লালবেগি, মাংটা, মেহতর।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আদমসুমারী প্রতিবেদন থেকেও অনুরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে। যারা আগ্রহী তারা সেগুলি দেখতে পারেন। তবে বাংলার তথ্যে এটা দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট যে, মুসলমানরা শুধু জাতপাত প্রথা নয়, অস্পৃশ্যতাকেও মেনে চলে।

অতএব, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের মতোই সামাজিক কু-প্রথায় দীর্ণ। বস্তুতঃ হিন্দুদের সব সামাজিক কু-প্রথাই মুসলমানদের রয়েছে এবং তার সঙ্গে আরও বেশি কিছু রয়েছে। এই আরও বেশি কিছুর মধ্যে রয়েছে মুসলমান মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক পর্দা প্রথা। (Ibid 228-230)

মুসলমানদের মধ্যে এইসব কু-প্রথার অস্তিত্ব যথেষ্টই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এইসব কু-প্রথা দূর করতে পারে সেই রকম যথেষ্ট ব্যাপক সংগঠিত সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নেই, এই ব্যাপারটি আরও বেশি দুঃখজনক। হিন্দুদেরও সামাজিক কু-প্রথা রয়েছে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তাদের ক্ষেত্রে বেশ স্বস্তিদায়ক, তা হচ্ছে, হিন্দুদের মধ্যে কয়েকজন কু-প্রথাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এইসব প্রথা বিলোপের জন্য সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করছেন। অন্যদিকে মুসলমানরা এগুলি যে কু-প্রথা তা উপলব্ধি করে না এবং তার ফলে সেগুলি বিলোপের জন্য আন্দোলনও করে না। বরং তারা তাদের প্রচলিত রীতিতে যে কোনও পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। উল্লেখযোগ্য, মুসলমানরা ১৯৩০-এ কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক সভায় আনা বাল্য বিবাহ বিলের বিরোধিতা করেছিল। তারা যে প্রতিটি পর্যায়ে বিরোধিতা করেছিল, তাই নয়, এটি যখন আইনের পরিণত হ'ল, তারা সেই আইনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল। (Ibid 233)

(1) ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নিশ্চলতার ব্যাখ্যা এক-ই। মুসলমান রাজনীতিকরা তাদের রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে জীবনের ধর্ম নিরপেক্ষ ধারণাগুলিকে স্বীকার করেন না, কারণ তাদের কাছে এর অর্থ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের সম্প্রদায়কে দুর্বল করা। ধনীদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য দরিদ্র মুসলমান দরিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবে না। জমিদারের অত্যাচার প্রতিরোধে মুসলমান প্রজারা যোগ দেবে না, হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াইতে মুসলমান শ্রমিকেরা হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে জোট বাঁধবে না। কেন? উত্তরটি সহজ। দরিদ্র মুসলমান দেখে, সে যদি ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সংগ্রামে যোগ দেয় তাহলে তার লড়াই একজন ধনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। মুসলমান প্রজা অনুভব করে, জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে যদি যোগ দেয়, একজন মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে যেতে পারে। মুসলমান প্রজা অনুভব করে, জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে যদি যোগ দেয়, একজন মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হতে পারে। একজন মুসলমান শ্রমিক অনুভব করে, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের আন্দোলনে সে যদি যোগ দেয়, একজন মুসলমান কারখানা মালিকের স্বার্থের ওপর সে আঘাত হানতে পারে। একজন ধনী মুসলমান, একজন মুসলমান জমিদার অথবা একজন মুসলমান কারখানা মালিকের স্বার্থের ওপর যে কোনও আঘাত করলে সে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্টই করবে, এ বিষয়ে সে সচেতন। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তখন তার সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে। (Ibid p 236-296)

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসকে লেখা এক চিঠিতে লালা লাজপত রায় অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—

'আরও একটি বিষয় আছে যা সম্প্রতি আমাকে খুব-ই বিচলিত করছে এবং আমি চাই আপনিও সতর্কভাবে চিন্তা করুন। প্রশ্নটি হচ্ছে হিন্দু মুসলমান ঐক্য। গত ছ' মাসে আমার বেশিরভাগ সময় আমি মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলমান আইন পড়ার কাজে নিয়োজিত করেছি। আর এই চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি যে এটা সম্ভব বা প্রযোজ্য কোনওটাই নয়। অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমান নেতাদের

আন্তরিকতা ধরে নিয়ে ও স্বীকার করে নিয়েও আমি মনে করি তাদের ধর্ম এ ধরনের কোন কিছুর পক্ষে কার্যকর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আপনার মনে আছে, কলকাতায়, আপনাকে আমি হাকিম আজম খান ও ড. কিচলুর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা জানিয়েছিলাম। হিন্দুস্থানে হাকিম সাহেবের চেয়ে পরিমার্জিত মুসলমান নেই। কিন্তু অন্য কোনও মুসলমান নেতা কি কুরআনকে অগ্রাহ্য করতে পারেন? আমি শুধু আশা করতে পারি যে ঐসলামিক আইন পড়ে আমি বুঝেছি, তা ভুল, এটা এরকম যে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুই আমাকে বেশি স্বস্তি দেবে না। কিন্তু আমার বুঝা যদি ঠিক হয়, তবে তার অর্থ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। গণতান্ত্রিক ধারায় হিন্দুস্থানকে শাসন করার বিষয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। তাহলে প্রতিকার কী? হিন্দুস্থানের পাঁচ কোটি নিয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু আমি মনে করি হিন্দুস্থানের সাত কোটির সঙ্গে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র মুসলমানরা হবে অপ্রতিরোধ্য। আমি সত্যি এবং আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতায় বিশ্বাস করি। মুসলমান নেতাদের বিশ্বাস করতেও আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলির ব্যাপারে কী হবে? নেতারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। তাহলে কি আমরা ধ্বংসের মুখে? আমি আশা করি তা হবে না। আমি আশা করি বিদগ্ধ মন ও প্রাজ্ঞ মস্তিষ্ক এই অসুবিধার মধ্যেই কোনও একটা পথ খুঁজে নেবে।

[Quoted by Ambedkar in Pakistan or Partition of India P 275-276]

আমরা কখনও মুসলমান ভ্রাতৃগণের তোষামোদ করি নাই, করিবও না, সরলমনে একপ্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে জাতি সংগঠন কার্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিয়াছি। সেই আহ্বান শ্রবণ করিয়া নিজের হিত ও কর্তব্য নির্ধারণ করা তাঁহাদের বুদ্ধি, ভাগ্য ও সাধুতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি করিতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় সাহায্যে করিব না।

—শ্রী অরবিন্দ

মূল্য— ১৫ টাকা

মুদ্রক ঃ
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬,
ফোন ঃ (০৩৩) ২৩৬০-৪৩০৬